চিত্রাঙ্গদা

মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে মনের অর্গল মুক্ত হয়, হৃদয়ে সঞ্চিত আবেগ প্রভাতী ফুলের মতো 'কথা' হয়ে ফুটে ওঠে। একথা রবীন্দ্রনাথ জানতেন। তাই জমিদারি দেখাশোনার কাজে পল্লীপ্রকৃতির নৈকট্যে এসে জীবনের শ্রেষ্ঠতম সাহিত্য-ঋণশস্য তুলে দিতে পেরেছিলেন কালের তরণীতে। তাঁর নির্জন প্রবাসের দিনগুলি প্রতিনিয়ত তন্বী প্রকৃতির সাহচর্যে পূর্ণ হয়ে উঠতো। 'প্রতিদিবসের হরষে বিষাদে চিরকল্লোলময়'[১] জীবনকে প্রত্যক্ষ করাই শুধু নয়, তার মত্যস্বরূপের অন্বেষণেও তখন করিব মন ছিল উন্মুখ। জীবনের বহিরঙ্গ চর্চায় রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই উৎসাহী ছিলেন না। সৌন্দর্যের অনির্বচনীয় গভীরতা, যা 'ইন্দ্রিয়ের চূড়ান্ত শক্তিরও অতীত' তাতেই তিনি ছিলেন নিমগ্ন। আর সেই কারণেই আগাছার জঙ্গলে ফুটে থাকা ফুলের রঙীন উচ্ছ্বাসের স্থায়িত্বের প্রশ্নে মনের ভিতর থেকেই উত্তর পেয়েছিলেন— 'ফুলের ফুরায় যবে ফুটিবার কাজ/ তখন প্রকাশ পায় ফল।'[২] জীবন আসলে এই অন্তরঙ্গের সাধনা। সেখানেই আত্মার স্থায়ী পরিচয়, যেখানে ক্লান্তি, অবসাদ, অভ্যাসের ধূলিপ্রলেপে উজ্জ্বলতার মালিন্য নেই। এই ভাবই কিছু সময় পরে 'মহাভারতে'র চিত্রাঙ্গদার কাহিনী অবলম্বনে বিস্তারলাভ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ তখন জমিদারি তদারকির কাজে উড়িষ্যার পাণ্ডুয়ায়। সেখানে নিভৃত পল্লীকুঠির নির্জনতার অবকাশে রচিত হয়েছিল সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী' এই কাব্যনাট্য — 'চিত্রাঙ্গদা' (২৮ ভাদ্র ১২৯৮)। 'চিত্রাঙ্গদা' গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয় ১২৯৯ তে এবং অবনীন্দ্রনাথের আঁকা ছবিসহ সচিত্র এই গ্রন্থটি 'আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত' হয়। এরই অল্প কিছুদিন পরে এমারেল্ড থিয়েটারে 'চিত্রাঙ্গদা' অভিনীতও হয়েছিল।[৩] এই প্রকাশ ও অভিনয়ের প্রায় তেতাল্লিশ বছর পরে ১৯৩৬-এ রবীন্দ্রনাথ এটিকে নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করেন। তবে এর মাঝে ১৯১৩ সালে 'চিত্রাঙ্গদা'র ইংরেজি অনুবাদ 'Chitra' নামে বিলাতেও প্রকাশিত হয়। ১৯২৪-এর ৮মে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা থেকে পিকিঙ-এ এলে তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে সেখানে সভা ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ক্রেসেন্ট মুন সোসাইটির উদ্যোগে আয়োজিত এই উৎসবে 'চিত্রাঙ্গদা'র ইংরেজি অনুবাদ 'Chitra'-র অভিনয় হয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এর অভিনয়ে ছিলেন চীনা তরুণ-তরুণীরাই। জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ সেদিন ধুতি-পাঞ্জাবি চাদর পরে বাঙালিবেশে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। এইদিনই তাঁকে 'চু-চেন-তান' অর্থাৎ 'ভারতের মেঘমন্দ্রিত প্রভাত' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। মৃত্যুর কয়েকমাস আগেও চীনে অনুষ্ঠিত জন্মদিনের এই সুখস্মৃতি মন্থন করেছেন কবি, যা 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থে কবিতার অবয়বে গাঁথা আছে (৩ সংখ্যক কবিতা)। এই কবিতায় বলেছেন 'যেখানেই বন্ধু পাই সেখানেই নবজন্ম ঘটে'।[৪] এ নবজন্ম শুধু জীবনের ক্ষেত্রে নয়, সৃষ্টির ক্ষেত্রেও। একই রচনা উপস্থাপনে, উপলব্ধিতে

Scanned by CamScanner

কিম্বা আস্বাদনে নতুন হয়ে ওঠে। 'চিত্রাঙ্গদা' সম্পর্কেও একথা সত্য। এতে ছদ্ম পরিচয়ের আবরণ উন্মোচনে অন্তরের যে সত্য মানুষের প্রকাশ ঘটেছিল, সারাজীবনে তা-ছিল কবির অনিষ্ট। পূর্বোক্ত কবিতাতেও জীবন সম্পর্কে এই অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

'চিত্রাঙ্গদা'র কাহিনী মহাভারতের আদিপর্ব থেকে গৃহীত হলেও এতে স্বাভাবিকভাবেই রবীন্দ্রনাথ অনেক পরিবর্তন এনেছিলেন। আবার কাব্যনাট্য থেকে নৃত্যনাট্য একে রূপান্তরিত করার সময়েও তা পরিবর্তিত হয়েছে। শৈল্পিক প্রয়োজনেই নৃত্যনাট্যে 'চিত্রাঙ্গদা' অনেক পরিমিত ও ঘনপিনদ্ধ কাহিনীর অবয়ব লাভ করেছে। কাব্যনাট্যে এগারো সংখ্যক দৃশ্য নৃত্যনাট্যে ছ'টি দৃশ্যে সংহত হয়েছে। অর্থ দিয়ে বদ্ধ ভাষা যখন মুক্তির অবকাশ খোঁজে তখন লেখক মনের আবেগ প্রকাশক সংলাপকে ছন্দের আশ্রয়ে সুন্দর করে তোলেন। কাব্যনাট্য রচনায় এই বিষয়টি জরুরি। এখানে চরিত্রগুলি আত্মকথন ও আত্মউন্মোচনের সুযোগ পায় এবং 'তারই মধ্য থেকে গড়ে' ওঠে 'এক ধরনের পৃথক নাট্যকতা।'[৫] আসল কথা হলো, কাব্যনাট্য অনেক বেশি লিরিকাল, আর নৃত্যনাট্য ড্রামাটিক। সংলাপ, সুর বা গান এবং নৃত্য—এই তিনের সমন্বয়ই এর গঠনগত বৈশিষ্ট্য।

মণিপুররাজের ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে শিব বর দিয়েছিলেন, তাঁর বংশে কেবল পুত্রই জন্মাবে। তা সত্ত্বেও যখন চিত্রাঙ্গদার জন্ম হলো তখন রাজা তাকে পুত্ররূপেই পালন করলেন। রাজকন্যা ধনুর্বিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করলেন। এদিকে অর্জুন দ্বাদশবর্ষ-ব্যাপী ব্রহ্মচর্যব্রত নিয়ে এসেছেন মণিপুরে। চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে তাঁর দেখা হলো। এই অংশ থেকেই কবিকৃত আখ্যানের সূত্রপাত। কাব্যনাট্যে মদন ও চিত্রাঙ্গদার কথোপকথনে এই বিষয়গুলি উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু চিত্রাঙ্গদার জীবনে পরিবর্তন এসেছে অর্জুনের সঙ্গে তার সাক্ষাতের পর। অর্জুনের মুখে তার পরিচয় জেনে চিত্রাঙ্গদা ভেবেছে— 'এই পার্থ! আজন্মের বিস্ময় আমার!' এতদিন যাকে চোখে দেখেনি, শুধু বাঁশি শুনেছে, এখন তাকে সামনে দেখে চিত্রাঙ্গদার অবস্থা- 'মনপ্রাণ যাহা ছিল দিয়ে ফেলেছি'।[৬] কিন্তু ব্রহ্ম চারিব্রতধারী অর্জুন সহজেই চিত্রাঙ্গদার প্রণয়-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। খুব স্বাভাবিক কারণেই এই প্রত্যাখ্যান যে-কোনো নারীর কাছে লজ্জার। এ যেন তার নারীত্বের অবমাননা। তাই মদনের কাছে চিত্রাঙ্গদা প্রার্থনা জানিয়েছে 'শুধু এক দিবসের তরে ঘুচাইয়া দাও, / জন্মদাতা বিধাতার / বিনাদোষে অভিশাপ, নারীর কুরূপ / করো মোরে অপূর্ব সুন্দরী।' তবে বসন্ত তাকে আশ্বস্ত করে বলেছে— '....শুধু একদিন নহে, /বসন্তের পুষ্পশোভা এক বর্ষ ধরি / ঘেরিয়া তোমার তনু রহিবে বিকশি।' কিন্তু এই প্রাপ্তির পরেই চিত্রাঙ্গদার অন্তর্দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। যে অর্জুন তার কাঙ্খিত, যার জন্য 'কুরূপা' থেকে 'সুরূপা'য় তার উত্তীর্ণ হওয়া; সে যখন চিত্রাঙ্গদার হৃদয়দ্বারে প্রেমার্ত অতিথি রূপে এসে দাঁড়ালো, তখন-ই দ্বিধান্বিত, দ্বন্দ্ব-জর্জরিত চিত্রাঙ্গদার মনে হয়েছে— কামনা দিয়ে কি সাধনাকে খণ্ডিত করা যায়? তাই অর্জুনকে সতর্ক করে সে বলেছে, 'ধিক্ পার্থ, ধিক্! / কে আমি, কী আছে মোর, কী দেখেছ তুমি,/ কী জান আমারে।'

Scanned by CamScanner

কিন্তু চিত্রাঙ্গদা কি শুধু অর্জুনকে ধিক্কার জানিয়েছে? একী প্রকারান্তরে তার আত্মধিক্কার নয়? পুরুষের কাছে শুধুমাত্র নিজের রূপের নৈবেদ্য নিবেদনে নারীর গৌরব নেই, আছে লজ্জা ও অবমাননা। বাহ্যিক রূপের এই প্রদীপ জ্বেলে নারী তার অন্তরের সৌন্দর্য অন্ধকারেই আবৃত করে। এতে আর যাই থাকুক, নারীর সম্মান ও প্রেমের মর্যাদা নেই। তাই সৌন্দর্যময়ী চিত্রাঙ্গদাকে দেখে অর্জুনের চিত্ত পরিবর্তনে জয়ের গৌরব আস্বাদন করতে পারে নি সে, মনে হয়েছে— 'আমারে করিল অতিক্রম আমার এ তুচ্ছ, দেহখানা,....।' চিত্রাঙ্গদা জানে তার এই রূপ ক্ষণস্থায়ী। ছদ্মবেশের আড়ালে যে সত্য পরিচয় আচ্ছন্ন হয়ে আছে তা একদিন প্রকাশিত হবে। শুধুমাত্র পুরুষের অঙ্কশায়িনী হওয়ার জন্য নারীর রূপের সত্যিই কি এত প্রয়োজন আছে? চিত্রাঙ্গদাও সত্য উপলব্ধির আলোকে তাই ভাবতে পেরেছে—'এই ছদ্মরূপিণীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আমি শতগুণে।' কারণ সে জানে অর্জুন যাতে মুগ্ধ সে তার ছদ্মরূপ, বহিরঙ্গের সৌন্দর্য; এতে 'সত্যি আমি'-টার স্বীকৃতি নেই। অথচ চিত্রাঙ্গদা অসচেতনভাবে সমাজ-প্রচলিত ভোগের পথেই অর্জুনের কামনা উদ্রেক করতে চেয়েছে। এইভাবে এইভাবে নারী নিজেই পুরুষের কাছে এবং নিজের কাছেও নিজেকে হীন করে তোলে। কারণ পুরুষের চোখ দিয়ে জগৎটা দেখার অভ্যাস থেকে নারী নিজেকে মুক্ত করতে শেখেনি। চিত্রাঙ্গদা যখন অর্জুনকে মুগ্ধ করার জন্য তার পুরুষের বেশ দূরে নিক্ষেপ করেছে, পরিবর্তে অঙ্গে তুলে নিয়েছে 'রক্তাম্বর, কঙ্কন কিঙ্কিনী কাঞ্চি', কিম্বা মদনের কাছে আক্ষেপ করে বলেছে— 'তবু শিখি নাই, দেব, তব পুষ্পধনু / কেমনে বাঁকাতে হয় নয়নের কোণে।'— তখন সঙ্গত কারণেই মনে পড়ে সিমোন দ্য বোভওয়ারের উক্তি— 'Woman on the contrary, knows that when she is looked at she is not considered apart from her appearance; she is judged, respected, desired, by and through her toilette.'

(The Second Sex)

ড. সুতপা ভট্টাচার্য 'সে নহি নহি' গ্রন্থে চিত্রাঙ্গদার মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যায় বলেছেন- আপাতদৃষ্টিতে চিত্রাঙ্গদা আর অর্জুনের সম্পর্ক পোষ্য-পোষকের সম্পর্ক নয়। প্রভু-ভৃত্য কিম্বা রাজা-প্রজা সম্পর্কের সমান্তরাল কোনো সম্পর্কে অর্জুন ধরা দেয় নি চিত্রাঙ্গদার কাছে।...বলা যায় ভিন্ন-লৈঙ্গিক ভালোবাসার বর্ণমালাতেই জড়িয়ে আছে এতকাল সেই গোপন-অনুশাসন পুরুষনিরপেক্ষ কোনো সাধনা নেই নারীর।'[৭] চিত্রাঙ্গদাও যেন নিজের অজান্তে এই ব্যবস্থাকে সমর্থন করেছে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোয় পুরুষের ইচ্ছে-অনিচ্ছেকে 'সম্ভ্রমহীনভাবে' প্রশ্রয় দিয়েছে। তার শিক্ষা-জ্ঞান, যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতা — এসব কোনো কিছুই তাকে অর্জুনকে বিমোহিত করার জন্য অপরূপা নারীর ছদ্মবেশ ধারণে আত্মমর্যাদাহীনতার গ্লানিতে বিদ্ধ করেনি। সে দহন শুরু হয়েছিল পরে। আসলে ক্ষত্রিয়বংশজাত চিত্রাঙ্গদার শিক্ষা-দীক্ষা তার মনে যে ব্যক্তিত্ব গড়ে দিয়েছিল, কোনো-না-কোনোভাবে তার বহিঃপ্রকাশ ছিল অভিপ্রেত। কন্যা সন্তানকে পুত্রের মতো বড়ো করার ক্ষেত্রে লিঙ্গরাজনীতির যে অভিপ্রায়ই থাকুক না কেন, তা চিত্রাঙ্গদার নারীসত্তাকে

Scanned by CamScanner

মুছে দিতে পারে নি। তাই অর্জুনকে দেখার পর খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তার কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে- "সেই মুহূর্তেই জানিলাম মনে, নারী / আমি'। এ এক অর্থে চিত্রাঙ্গদার মুক্তি, নবজন্ম। এই অভিজ্ঞতা তাকে এতটাই বিস্ময় বিহ্বল করেছে যে, যে-কোনো উপায়ে অর্জুনকে পাওয়াই হয়তো তার লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। অবশ্য এর সঙ্গে ছিল আহত ব্যক্তিত্বও। প্রত্যাখ্যাত নারীর অপমানাহত অভিমানক্ষুব্ধ মনকে প্রশমিত করার বাসনা। মদন ও বসন্তের সাহায্য প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি পেয়েও আত্মসম্মান-বোধের কারণেই চিত্রাঙ্গদা যেন কিছুটা আত্ম-অনুধাবনে তৎপর — 'সময় থাকিত যদি, একাকিনী আমি / তিলে তিলে হৃদয় তাঁহার করিতাম / অধিকার, নাহি চাহিতাম দেবতার সহায়তা।'

একথা অবশ্য ঠিক, অর্জুনের প্রত্যাখ্যান চিত্রাঙ্গদাকে আহত করলেও তার ব্রহ্মচর্যের ব্রত পালনকে সে তুচ্ছ ক'রেই দেখেছে এবং এই কারণকে মনে মনে অস্বীকার করার সময় পুরুষের চঞ্চল মতি ও কামপ্রবৃত্তিকে বিদ্রুপবিদ্ধ করেছে। অবশ্য সেই সঙ্গে আছে তার আত্ম-ধিক্কারও—'পুরুষের ব্রহ্মচর্য! / ধিক্ মোরে, তাও আমি নারিনু টলাতে। /...কত ঋষি মুনি / করিয়াছে বিসর্জন নারীপদ তলে / চিরার্জিত তপস্যার ফল।' এই মুক্তদৃষ্টি ও বোধের স্বচ্ছতার কারণে চিত্রাঙ্গদা রবীন্দ্রসাহিত্যে অনন্য। পুরুষ ও নারীর সম্পর্কে রূপাসক্তি ও দেহ কামনা থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাতে নারী-পুরুষ উভয়ের ভূমিকা কাঙ্খিত। চিত্রাঙ্গদাও অর্জুনকে নিজের সবটুকু উজাড় করে দিতে চেয়েছে—'লহো লহো, যাহা কিছু আছে/ সব লহো জীবনবল্লভ।' কিন্তু এই মিলনে পূর্ণতার অবকাশ কোথায়? শুধু রূপজ ও দেহজ মোহ-ই তো প্রেমের একমাত্র সত্য হতে পারে না! এ উন্মাদনা অবসিত হতে বাধ্য। নিরলস ভোগেরও ক্লান্তি আছে। কর্তব্যহীন প্রেম ও জীবনে সে ক্লান্তি আরও বর্ধিত হয়। তাই অর্জুনও বহুদিন স্তব্ধ ও অলস হয়ে থাকা বাহুদ্বয়কে নবীন গৌরবে পূর্ণ করতে চেয়েছে দস্যুদলকে প্রতিরোধ করার সংকল্পে। এতদিনে শুধু নারীর রূপ নয়, নারীর বীরত্বও তার কাছে রমণীয় মনে হয়েছে। 'স্নেহে নারী, বীর্যে সে পুরুষ'— এমন কোনো নারীকে সত্যিই যদি পুরুষ পেতে চায়, তবে তা সমাজের পক্ষেও কল্যাণকর 'রূপের অতীত রূপের' আলোকেই প্রেমিক তার প্রেয়সীকে দেখুক। অবিরাম ভোগের সীমায় খণ্ডিত প্রেমের মুক্তি এভাবেই সম্ভব। অর্জুনও অবশেষে সেই নারীকে চেয়েছে যে রূপে নয়, সাহসে, ব্যক্তিত্বে, প্রেম ও দয়াধর্মে পূর্ণ বিকশিত। লজ্জা-ভয়-সংকোচে যে অবগুণ্ঠনবতী নয়। তবে পুরুষ-নারী একে অপরের পরিপূরক এবং নারীর ভিতরে যে পৌরুষের অধিষ্ঠান, তার সঙ্গে নারীত্বের মিলনেই পরিপূর্ণ সত্তার প্রকাশ— এমন বিশ্বাসে পৌঁছতে অর্জুনের সময় লেগেছিল। আসলে সময়ই আমাদের উপলব্ধির গভীরতায় পৌঁছে দেয়। অর্জুনের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি।

কেট মিলেট তাঁর 'Sexual Politics' গ্রন্থে নিষ্ক্রিয় নারী ও সক্রিয় পুরুষ সম্পর্কিত আলোচনায় বুদ্ধিবৃত্তি, শক্তি ইত্যাদি পুরুষালি লক্ষণ এবং নিষ্ক্রিয়তা, অজ্ঞানতা ও আনুগত্য প্রভৃতি মেয়েলি লক্ষণ; সর্বোপরি পুরুষালি লক্ষণযুক্ত নারী পিতৃতন্ত্রের কাম্য নয়—এমন প্রচলিত ধারণার তীব্র সমালোচনা করেছেন। চিত্রাঙ্গদা আমাদের পুনরায়

Scanned by CamScanner

সেই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়। আসলে এই সামাজিক ব্যবস্থাই নারীকে ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় ও অক্ষম করে তোলে। এর বিপরীত প্রান্তে রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার অবস্থান 'রূপে তোমায় ভোলাব না/ ভালবাসায় ভোলাব'—এমন উচ্চারণের থেকেও বলিষ্ঠ তার পদচারণা। আমরা জানি, খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রতিবন্ধকতার অন্তঃস্থলেই তৈরি হয় প্রতিরোধের সংকল্প। সমাজে নারীর আত্মনির্ভরশীলতা ও আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধান সেই প্রতিরোধের বার্তাবহ। চিত্রাঙ্গদার আত্মস্বরূপের সন্ধানে অনেক দ্বিধাসংকীর্ণ পথ তাকে অতিক্রম করতে হয়েছে এবং আত্মগ্লানির মধ্য দিয়ে ঘটেছে তার মানসিক উত্তরণ। দ্বিধার মধ্য দিয়ে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। তাই অর্জুনের আকুল আহ্বানের উত্তরে সে বলেছে— 'আমি নহি, আমি নহি, ... যাও, ফিরে যাও বীর। মিথ্যারে কোরো না উপাসনা।' বসন্তের বরে প্রাপ্ত 'বর্ষাকাল অপরূপ রূপ' তার কাছে 'হীন ছদ্মবেশ' বলে মনে হয়েছে। আসলে এ তো তার সত্য বাইরের পরিচয় নয় মিথ্যার অভ্যাসে চিত্রাঙ্গদার যে পরিচয় ছলনাভাবে ঢাকা পড়েছে, তা তার বাইরের পরিচয়। নারী নিজেই যেখানে শক্তির আধার, সেখানে 'ছলনার ভারে' 'বীরের হৃদয় শ্রান্ত' করাও তার যোগ্য কাজ নয়, আর চিত্রাঙ্গদার সত্য 'আমি' সেই ইচ্ছাও করে না। তাই অর্জুনকে বলিষ্ঠ উচ্চারণে সে বলেছে—'সেও আমি নহি।' সমাজে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির এবং নারী-পুরুষের সামঞ্জস্য ও সাম্যে বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্গদার সংলাপে যুক্ত করেছেন নারীর স্বাধিকারের সেই প্রশ্নটি। ১৯২৯-এ প্রকাশিত 'মহুয়া' কাব্যের 'সবলা' কবিতাটি এ প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি— 'কেন নিজে নাহি লব চিনে/ সার্থকের পথ।/ কেন না ছুটাব তেজে সন্ধানের রথ/ দুর্ধর্ষ অশ্বেরে বাঁধি ঝয বল্গা পাশে।'[৯] এর প্রায় সাত-আট বৎসর পরে প্রকাশিত 'কালান্তর' (১৯৩৭)- এর 'নারী' প্রবন্ধে বলেছিলেন— 'মানুষের সৃষ্টিতে নারী পুরাতনী। নরসমাজে নারীশক্তিকে বলা যেতে পারে আদ্যাশক্তি।'[১০] রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন সভ্যতার অগ্রগামিতা নারী-পুরুষ উভয়ের যুগ্ম ক্রিয়া ও উদ্যোগের দ্বারাই সম্ভব। তাই এক 'অর্ধনারীশ্বরে'র কথা তিনি বলেছেন, যে আসবে নতুন যুগের বার্তা নিয়ে। অর্জুনও নারীকে পেতে চেয়েছে এইভাবেই, যেখানে রূপের চেয়ে মানুষ বড়ো। কোনো দেবী নয়, 'সামান্যা রমণী'ও অসামান্যা হয়ে উঠতে পারে যদি সংসারের বৃহৎ কর্মযজ্ঞে ও পুরুষের পাশে থাকার উপযুক্ত মর্যাদা ও দায়িত্ব সে পায়। নারীকে ব্রাত্য ক'রে সমাজের একপাশে সরিয়ে রাখায় শুধু নারীরই অবমাননা নয়, তা মনুষ্যত্বের অবমাননাও। চিত্রাঙ্গদা সেই নারী যে 'অন্ধসংস্কারের কারখানায় গড়া পুতুল খেলা'র[১১] পরিসীমা ভেঙে অর্জুনকে বলতে পেরেছে—'যদি পার্শ্বে রাখ/ মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার/যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর/ কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে, / যদি সুখ দুঃখে মোরে কর সহচরী, / আমার পাইবে তবে পরিচয়।' পূর্বোক্ত প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন— '....নারীর মধ্যে প্রেয়সী, নারীর মধ্যে জননী প্রকৃতির দৌত্যে স্থিরপ্রতিষ্ঠ হয়ে আপন কাজ করে চলেছে।'[১২] কাব্যনাট্যে চিত্রাঙ্গদার শেষ সংলাপে আছে এক গৌরবময় প্রতিশ্রুতির অভিব্যক্তি, যা তার কর্তব্যসচেতন চিত্তের প্রকাশ, প্রকাশ এক সম্পূর্ণ মানবীর—'গর্ভে / আমি ধরেছি যে সন্তান তোমার,

যদি/ পুত্র হয়, আশৈশব বীরশিক্ষা দিয়ে / দ্বিতীয় অর্জুন করি তারে একদিন/ পাঠাইয়া দিব যবে পিতার চরণে—/ তখন জানিবে মোরে, প্রিয়তম।' উল্লেখিত অংশটি নারীত্বের পূর্ণতা ও সংসার-জীবনের চরম সার্থকতার পরিচায়ক। পুরুষও নারীকে নারী রূপেই পেতে চায়, দেবী বা মায়ারূপে নয়। অর্জুন মানব-সত্তার পূর্ণ বিকাশের বিভায় যে চিত্রাঙ্গদাকে চিনেছে, সে জীবনের প্রশস্ত ভূমিকায় দাঁড়িয়ে আত্মপরিচয় অনুসন্ধান করে, যা এক অর্থে তার আত্মানুসন্ধান। শুধুমাত্র পুরুষের ছায়া হিসাবে নয়, চিত্রাঙ্গদা স্বাধীনভাবে তার আপন পরিচয়ের গৌরব আস্বাদন করতে চেয়েছে। সেখানেই তার নিজস্বতা—'আমি চিত্রাঙ্গদা। রাজেন্দ্রনন্দিনী'— এই স্পষ্ট উচ্চারণে কোনো জড়ত্ব নেই, আছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্পষ্ট প্রকাশ। 'চিত্রাঙ্গদা' তাই জৈবিক কামনা থেকে মানসিক উদ্‌বর্তনের এক আশ্চর্য আলেখ্য।

রবীন্দ্রনাথের নিজের কাছেও অত্যন্ত প্রিয় ছিল 'চিত্রাঙ্গদা'। প্রিয় বলেই তিনি একে নৃত্যনাট্যের রূপ দিয়েছিলেন। বিভিন্ন চিঠিপত্রে কবি তা উল্লেখ করেছেন। তাঁর বিচারে 'চিত্রাঙ্গদা' একটি 'বিশেষ সৃষ্টি'। (ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি) 'নাচে গানে বর্ণচ্ছটায় এর অপরূপ সৌন্দর্যময় অভিব্যক্তি। ১৯৩৬-এ অমিয় চক্রবর্তীকে পত্রে লিখেছিলেন— 'গল্পটাকে নাচে গানে গেঁথে নাট্যমঞ্চের উপরে প্রকাশ করা হয়েছে। এই পালাটা নিয়ে আমরা জয়যাত্রায় বেরিয়েছিলাম। কলকাতা পাটনা এলাহাবাদ দিল্লী মিরাট লাহোর এই কয় জায়গায় আসর জমিয়েছিলুম।' মনে হয়, নৃত্যনাট্যে 'চিত্রাঙ্গদা'কে আরও আবেদন সমৃদ্ধরূপে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন তিনি। 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' গ্রন্থে শান্তিদেব ঘোষের অভিমত আমাদের এই অনুমানকে সমর্থন করে— '.... নাটকে সাধারণ কথায় অভিনয় ভালো লাগে বটে, কিন্তু তার চেয়েও ভালো লাগে তাকে সুরের ভিতর দিয়ে যখন আমরা পাই। সবচেয়ে বেশি মন আকর্ষণ করে যখন দেহের ছন্দের নৃত্যভঙ্গিতে তা রূপ নেয়।'[১৩] এ প্রসঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্যটিও উল্লেখ করতে পারি— 'যৌবনের চিত্রাঙ্গদা—কাব্যের সম্ভার ছিল শব্দের, তার ধ্বনি সন্নিবেশ আবৃত্তিরই উপযোগী। নতুন চিত্রাঙ্গদার শব্দ, বাক্য ও ধ্বনি গৌণ, তার মুখ্যভাষা হলো নৃত্য। কাব্যাংশ বাদ পড়লেও মধ্যে রইল সংগীত। সে সংগীত রবীন্দ্রসংগীতের অন্তর্গত হলেও একটু নতুন ধরনের।'[১৪] আসলে নৃত্যনাট্যে সংগীত নৃত্যের উপযোগকারী ব্যবহৃত হয় এবং নৃত্যও পরিবেশিত হয় নাটকীয়ভাবে আর সঙ্গে নাট্যের সম্পর্ক যে দূরবর্তী নয় তা সম্ভবত আমাদের সকলেরই জানা। তবে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কাব্যনাট্য ও নৃত্যনাট্যরূপে 'চিত্রাঙ্গদা'র যে পার্থক্যগুলি উল্লেখ করেছেন তা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব মতামতেরই সমধর্মী— 'এই গ্রন্থের অধিকাংশই গানে রচিত এবং সে গান নাচের উপযোগী। একথা মনে রাখা কর্তব্য যে এই জাতীয় রচনায় স্বভাবতই সুর ভাষাকে বহুদূর অতিক্রম করে থাকে।' তবে কাব্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা'কে নৃত্যনাট্যে রূপান্তর কবির সুরের প্রতি সমর্থনই একমাত্র কারণ নয়। নিজের রচনাকে সময়ের অনেকটা ব্যবধানে নতুন রূপদানের অভিপ্রায়টিও এক্ষেত্রে সক্রিয় ছিল, যা রবীন্দ্রসৃষ্টিতে একাধিকবার লক্ষ্য করা গেছে।'

Scanned by CamScanner

'চিত্রাঙ্গদা'র বক্তব্যবিষয় এবং এতে ব্যক্ত রবীন্দ্রনাথের নারীভাবনা আধুনিক নারীভাবনা থেকে দূরবর্তী নয়। কবির নিজের কথায়— 'পুরুষ নারীকে তাহার মহত্তম স্বরূপে উপলব্ধি করে নাই। নারীকে যদি মাত্র ভোগ্যা বলিয়া জানা হয় তবে তাহাতে তো নারীত্বের সবচেয়ে অপমান। অথচ নারীরা নিজেদের সেই দাবীর কথা ভাবিয়াই গর্বে ভরপুর। এই হীন পরিচয়ের দায় মিটাইবার জন্যই চাই নারীর দিবারাত্রি সচেষ্ট সাধনা। নারীর যথার্থ স্বরূপের কথা আমি বলিয়াছি আমার চিত্রাঙ্গদা নাটকে।' চিত্রাঙ্গদা যথার্থই নারীর সেই অসম্মানের সীমাকে লঙ্ঘন করেছে। 'প্রেমাবেশে প্রেমের যে বন্ধন', তার ছলনা থেকে মুক্ত হয়ে 'সহজ সত্যের নিরলংকৃত মহিমায়' নিজেকে প্রকাশ করেছে সে। 'হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে সে নহি নহি'- চিত্রাঙ্গদার এই দৃপ্ত উক্তিতে আধুনিক নারীর ব্যক্তিত্ব এবং আত্মমর্যাদাবোধের অভিপ্রকাশ ঘটেছে।

নিত্যকৃষ্ণ বসু 'চিত্রাঙ্গদা'র আলোচনায় লিখেছিলেন— ''মহাভারতের মহাকবির অমর চরিত্র দুটিকে কোনো অংশে হীন না করিয়া কবি ইহাদের উপর আপনার কবিত্ব ও গুণপণার বিশিষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ... প্রেমের মূলে যে সৌন্দর্যানুভূতি ও আসঙ্গলিপ্সাই প্রবল, ইহাতে তাহা সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। .... কর্মহীন বিলাস-লীলা প্রেমের আদর্শ নহে, কর্তব্য পালনের পথে সাহচর্যই ইহার চরম উদ্দেশ্য। ..... সৌন্দর্যের মোহ, যৌবনের ভ্রান্তি, উপভোগের অরুচি, তৎপরে ভূষণবিহীন সত্যের অভ্যুদয়, ইহাই প্রেমের প্রকৃত ইতিহাস।'' 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্যের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথও প্রায় অনুরূপ কথাই বলেছিলেন— অন্তরের যথার্থ চারিত্রশক্তিই জীবনের ধ্রুব সম্বল এবং মোহমুক্ত শক্তির দানেই আত্মার স্থায়ী পরিচয়। এর পরিণামে ক্লান্তি, অবসাদ নেই; নেই অভ্যাসের ধূলিপ্রলেপে উজ্জ্বলতার মালিন্য। তথাপি 'চিত্রাঙ্গদা'র এই মর্মার্থ উপলব্ধি না করেই এর বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ উঠেছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর 'কাব্যে নীতি' রচনায় স্পষ্টই বলেছিলেন— '...ভারতচন্দ্র যাহাই করুন তিনি বিদ্যার যে ভোগবর্ণনা করিয়াছেন, তাহা দাম্পত্য প্রেমের সম্ভোগ—indecent কিন্তু immoral নয়। রবীন্দ্রবাবুর চিত্রাঙ্গদার সম্ভোগ অভিসারিকার সম্ভোগ। হিন্দু সমাজে কেন, পৃথিবীর কোনো সভ্যসমাজে এ চিত্রাঙ্গদা মুখ দেখাইতে পারিত না। ... ঘরে ঘরে এই চিত্রাঙ্গদা হইলে সংসার একেবারে উচ্ছন্ন যায়। ... রবীন্দ্রবাবু এই পাপকে যেমন উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন, তেমন বঙ্গদেশে আর কোনো কবি অদ্যাবধি পারেন নাই। সেইজন্য এ কুকীর্তি আরও ভয়ানক। ... ইহার সুন্দর ভাষা, মধুর ছন্দোবদ্ধ, ইহার উপমা ছটা অতুলনীয়। ...তথাপি এ পুস্তকখানি দগ্ধ করা উচিত।' বলাবাহুল্য, এই সমালোচনা 'চিত্রাঙ্গদা'র জনপ্রিয়তাকে হ্রাস করতে পারে নি।

কাব্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা'কে নৃত্যনাট্যে রূপ দেওয়ার সময় আগে রচিত এবং গীত হতো এমন কিছু গানও সংযুক্ত হয়েছে। হয়তো সেগুলির জনপ্রিয়তা এর অন্যতম কারণ। তবে নাটকের যে স্থানগুলিতে পুরনো গান ব্যবহার করেছেন তিনি, সেখানে ভারসাম্য রক্ষার জন্য ভাব অনুযায়ী গানের কথার পরিবর্তন করেছেন; সুর ও ছন্দের কোনো বদল ঘটান নি। 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্য সম্পর্কে প্রতিমাদেবীর আলোচনা থেকে এর

Scanned by CamScanner

নৃত্যকলার বিষয়টিও জানা যায়। ভারতীয় মণিপুরী ও দক্ষিণী শৈলী ছাড়াও য়ুরোপের নৃত্যভঙ্গি 'চিত্রাঙ্গদা'র নৃত্যকলায় যুক্ত হয়ে একে স্বতন্ত্র মাত্রা দিয়েছে। বলতে দ্বিধা নেই, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চিত্রাঙ্গদার উপস্থাপনা শান্তিনিকেতনের কলাচর্চার আদর্শই শুধু প্রচার করেনি, বিশ্বভারতীর শূন্য তহবিল পূর্ণ করতেও সাহায্য করেছিল।

'চিত্রাঙ্গদা'র কাহিনীতে প্রকৃতির বাস্তব সত্য মানবিক ভাবনায় রূপান্তরিত হয়েছে। ফুলের প্রস্ফুটন ও রৌদ্রের প্রখরতায় তার বর্ণের মালিন্যই যে শেষ কথা নয়, তার স্থায়ী পরিচয় আপন অপ্রগল্‌ভ ফলসম্ভারে— এই উপলব্ধি 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্য রচনার প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে এবং ভূমিকাতেই লেখক তা স্বীকারও করেছেন। সম্ভবত সেই কারণে 'চিত্রাঙ্গদা'য়, বিশেষত চিত্রাঙ্গদার সংলাপে ফুলের প্রসঙ্গ এসেছে বারবার। কয়েকটি উদ্ধৃতির উল্লেখ এ প্রসঙ্গে অবান্তর হবে না বলেই মনে হয়।

১। অর্জুন চিত্রাঙ্গদার প্রেমপ্রার্থী। কিন্তু সুরূপার ছদ্মবেশের আড়ালে আবৃত চিত্রাঙ্গদার সত্য পরিচয় চিত্রাঙ্গদারই অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণ হয়েছে। মদন ও বসন্তের কাছে সেই অন্তর্দহন ব্যক্ত করে চিত্রাঙ্গদা বলেছে—

কাল সন্ধ্যাবেলা
সরসীর তৃণপুঞ্জ তীরে পেতেছিনু
পুষ্পশয্যা, বসন্তের ঝরা ফুল দিয়ে।
* * *
যেন আমি রাজকন্যা নহি; যেন মোর
নাই পূর্বাপর ; যেন আমি ধরাতলে
একদিনে উঠেছি ফুটিয়া, অরণ্যের
পিতৃমাতৃহীন ফুল; শুধু এক বেলা
পরমায়ু, ...।

ঐ অংশেই — সপ্তপর্ণশাখা হতে
ফুল্লমালতীর লতা আলস্য-আবেশে
মোর গৌরতনু- 'পরে পাঠাইতেছিল
নিঃশব্দ চুম্বন; ফুলগুলি কেহ চুলে,
কেহ পদতলে, কেহ স্তনতটমূলে
বিছাইল আপনার মরণশয়ন।

২। মদন ও বসন্তের কাছে মিলনের স্মৃতি ব্যক্ত করে চিত্রাঙ্গদার উক্তি—

সে চিরদুর্লভ মিলনের সুখস্মৃতি
সঙ্গে করে ঝরে পড়ে যাবে অতিস্ফুট
পুষ্পদলসম, এ মায়ালাবণ্য মোর;

অন্তরের দরিদ্র রমণী, রিক্তদেহে
বসে রবে চিরদিনরাত।

৩। অর্জুনের সঙ্গে কথোপকথনে চিত্রাঙ্গদার দ্বন্দ্ব ও বিষাদদীর্ণ মনের পরিচয় ফুলের উল্লেখে প্রকাশিত—

অরণ্যের ফুল যবে
শুকাইবে, গৃহে কোথা ফেলে দিবে তারে,
অনাদরে পাষাণের মাঝে? তার চেয়ে
অরণ্যের অন্তঃপুরে নিত্য নিত্য যেথা
মরিছে অঙ্কুর, পড়িছে পল্লবরাশি
ঝরিছে, খসিছে কুসুমদল,
ক্ষণিক জীবনগুলি ফুটিছে টুটিছে
প্রতি পলে পলে, ... ।

৪। পুনরায় অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার সংলাপ—

এখনো যে বর্ষ যায় নাই, শ্রান্তি এরি
মাঝে? হায় হায়, এখন বুঝিনু পুষ্প
স্বল্পপরমায়ু দেবতার আশীর্বাদে।
গত বসন্তের যত মৃতপুষ্পসাথে
ঝরিয়া পড়িত যদি এ মোহন তনু
আদরে মরিত তবে।

৫। চিত্রাঙ্গদার সত্য পরিচয় অর্জুনের কাছে, উদ্‌ঘাটিত হওয়ার প্রাক্ মুহূর্তে চিত্রাঙ্গদার উক্তি—

যে ফুলে করেছি পূজা, নহি আমি কভু
সে ফুলের মতো, প্রভু, এত সুমধুর,
এত সুকোমল, এত সম্পূর্ণ সুন্দর।

* * *

কোথা পাব কুসুমলাবণ্য, দুদণ্ডের
জীবনের অকলঙ্ক শোভা।

তবে ফুলের পরিণতি ও পূর্ণতা যেমন ফলে, তেমনি মানবজীবনের পূর্ণতা মানবতার বিকাশে। সেখানে নারী-পুরুষ উভয়েরই সমান গুরুত্ব। 'চিত্রাঙ্গদা'য় রবীন্দ্রনাথ সেই 'যুগল জীবনের জয়যাত্রা'র কথা বলেছেন। প্রসঙ্গত মনে করতে পারি 'The Second Sex' গ্রন্থে বিবৃত সিমোন দ্য বোভেয়ারের মন্তব্যটি — 'When at last it will be possible for every human being thus to set his pride beyond the sexual differentiation, in the laborious glory of free existence, then only

will woman be able to identify her personal history, her problems, her doubts, her hopes with those of humanity; then only will she be able to seek in her life and her works to reveal the whole of reality and not merely her personal self. As long as she will have to struggle to become a human being ....'

গ্রন্থসূত্র :

১। 'আকাশের চাঁদ', 'সোনার তরী', রবীন্দ্ররচনাবলী প্রথম খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সং, পৃ. ৩৭২।
২। 'চিত্রাঙ্গদা' — ঐ পঞ্চম খণ্ড ঐ পৃ. ৪৫৬ ।
৩। রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রথম খণ্ড, চতুর্থ স. ১৩৭৭, পৃ. ৩৪৩।
৪। '৩' সংখ্যক কবিতা, জন্মদিনে, রবীন্দ্ররচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সং, পৃ. ৮৪১।
৫। নাট্যমঞ্চ নাট্যরূপ, পবিত্র সরকার, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৮, পৃ. ৪৫২।
৬। গীতিমালা, রবীন্দ্ররচনাবলী, চতুর্থখণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সং, পৃ. ৩২২।
৭। 'সে নহি নহি', সুতপা ভট্টাচার্য, বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন বিভাগ, ১৯৯০, পৃ. ১৩।
৮। 'রবীন্দ্রনাটকে নারীভাবনা', ড. বিশাখা রায়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, জানুয়ারী ২০১০, পৃ. ১০৪।
৯। 'সবলা', মহুয়া, রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সং পৃ. ৭৮৩।
১০। 'নারী' কালান্তর, ঐ ত্রয়োদশ খণ্ড জন্মশতবার্ষিক সং পৃ. ৩৭৫।
১১। 'নারী' কালান্তর, ঐ ত্রয়োদশ খণ্ড জন্মশতবার্ষিক সং পৃ. ৩৮০।
১২। 'নারী' কালান্তর, ঐ ত্রয়োদশ খণ্ড জন্মশতবার্ষিক সং পৃ. ৩৭৬।
১৩। 'রবীন্দ্রসংগীত', শান্তিদেব ঘোষ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ ১৪১৫ পৃ. ১৬৮।
১৪। 'কথা ও সুর', ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৯০ পৃ. ১০০।

Scanned by CamScanner